Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501012 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

The Spoken Language of the Rarh Region and Its Application in Literature
রাঢ় অঞ্চলের কথ্যভাষা ও সাহিত্যে তার প্রয়োগ

Dr. Srinibash Ghosh
Assistant Professor
Bengali Department
Raja Rammohun Roy Mahavidyalaya
Hooghly

Received on: 22nd March 2026
Accepted on: 30th March 2026

Abstract:
I would like to discuss the dialects of Birbhum and Burdwan districts in this article. For this, I have selected two Bengali novels: "Hansulubanker Upakatha" by Tarashankar Bandyopadhyay, which represents the dialect of Birbhum, and "Banapalashir Padabali" by Ramapada Choudhary, which represents the dialect of Burdwan. Additionally, I have also explored the social language of the Muslim community, as depicted in the novel "Agunpakhi" by Hasan Azizul Haque. I have noticed some differences between the characteristics of the Rardhi dialect of Bengali that have been discussed in Bengali linguistics for a long time and the spoken language of people in Birbhum and Burdwan districts. I believe there is a need for renewed research on Bengali dialects.

Key Words:
Language, Dialect, Dialect Community, Social Dialect, Literary Examples, Phonological Features, Morphological Features, Speech Style.

মূল প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ 'বাংলাভাষা-পরিচয়' গ্রন্থে ভাষা সম্পর্কে বলেছেন, "ভাষা বানিয়েছে মানুষ, এ কথা কিছু সত্য আবার অনেকখানি সত্য নয়। ভাষা যদি ব্যক্তিগত কোনো মানুষের বা দলের কৃতকার্য হত তাহলে তাকে বানানো বলতুম; কিন্তু ভাষা একটা সমগ্র জাতের লোকের মন থেকে, মুখ থেকে, ক্রমশই গড়ে উঠেছে।"[১] এই গড়ে ওঠার ধরণটি কীরকম? তিনি বলছেন, "ভাষা প্রথমে আরম্ভ হয় নানারকম দৈবাৎ শব্দসংঘাতে, তার পরে মানুষের 'দেহমনের স্বভাব' অনুসরণ করে সেইসব সংকেতের ধারায় সে ভরে উঠতে থাকে।"[২] অর্থাৎ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষের দেহমনের স্বভাব ভিন্ন হওয়ার জন্যই ভিন্ন ভিন্ন ভাষার জন্ম। আবার একই জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যেও স্থানভেদে, সামাজিক অবস্থাভেদে 'দেহমনের স্বভাবের' সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্য লক্ষ করা যায়। ঠিক এইখানেই ভাষার পাশাপাশি উপভাষা জন্মের ইতিহাসও লুকিয়ে আছে। বাংলা উপভাষার ক্ষেত্রে বলা যায় বাংলার অঞ্চলভেদে বাঙালিদের মধ্যে 'দেহ' তথা শারীরিক গঠনের তেমন পার্থক্য না থাকলেও 'মনের' ও 'স্বভাব'এর পার্থক্য কিছুটা থাকেই।

© Santiniketan Sahityapath

ভাষাতাত্ত্বিক ব্লুমফিল্ড ভাষা-সম্প্রদায়ের সংজ্ঞায় বলেছেন, "A Group of people who use the same system of speech-signals is a speech-community."[৩] এই দুই বক্তব্য বিচার করে আপনারাই বলুন রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ অধিকতর প্রাঞ্জল ও অধিকতর গভীর নয় কী? ব্লুমফিল্ড 'A Group of people' বিশেষ কথনরীতির কথা বলেছেন। কিন্তু কেন একটা সম্প্রদায়ের মানুষের কথনরীতি আলাদা হয়ে যায় সে-ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথেই মেলে। অথচ ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে আমরা কতখানিই-বা গুরুত্ব দিই?

যাই হোক মূল বক্তব্যে ফিরি। দেখুন 'ভাষা-সম্প্রদায়' বা 'দেহমনের স্বভাব'কে কেন্দ্র করেই এক একটি ভাষা গড়ে ওঠে আর এর পার্থক্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার জন্ম। যেমন, বাঙালি-সম্প্রদায় বলে — 'আমার নাম বিমল', স্পেনীয়তে সেটি হবে 'Me llamo Bimal' (মে ইয়ামো বিমল), জার্মান ভাষায় 'Ich heiße Bimal' (ইশ হাইসে বিমল), ফরাসিতে হবে 'Je m'appelle Bimal' (জ'মাপেল বিমল), ইতালিতে হবে 'Mi chiamo Bimal' (মি কিয়ামো বিমল) হিন্দিতে 'মেরা নাম বিমল', ওড়িয়াতে 'মো নাম বিমল', অসমিয়াতে 'মোর নাম বিমল'। বুঝতেই পারছেন যে বিশেষ একটি 'সমগ্র জাতের লোকের মন থেকে, মুখ থেকে, ক্রমশই' যে ভাষা জন্ম হয়ে হয়েছে তার সঙ্গে অন্য একটি জাতের ভাষার পার্থক্য আছে। আর ভাষার বোধগম্যতার সম্পর্কে বলা যায়, যে-জাতিগুলির মাধ্যে 'দেহমনের স্বভাবের' পার্থক্য কম সে-জাতিগুলি পরস্পর পরস্পরের ভাষা সহজে বুঝতে পারে, আর যে-জাতিগুলির মাধ্যে 'দেহমনের স্বভাবের' পার্থক্য বেশি সে-জাতিগুলি পরস্পর পরস্পরের ভাষা সহজে বুঝতে পারে না, এমনকি অন্য জাতির ভাষা না শেখা পর্যন্ত তাদের ভাষা বুঝতেই পারে না। যেমন একজন বাঙালি হিন্দি, আসমিয়া বা ওড়িয়া ভাষা যত সহজে বুঝতে পারবেন, ফরাসি বা ইতালি ভাষা তত সহজে বুঝতে পারবেন না — তারও কারণ জাতিগত পার্থক্যের রকমফের। ভাষার এই বৈশিষ্ট্যের কথা মাথায় রেখেই উপভাষার ক্ষেত্রেও বলা যায় অঞ্চলিক দূরত্বের পাশাপাশি 'দেহমনের স্বভাবের' বিশেষ করে 'মনের ও স্বভাবের' পার্থক্য উপভাষাগুলির পারস্পরিক বোধগম্যতাকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করে।

২

এবার উপভাষা প্রসঙ্গে আসা যাক। বাংলা ভাষাচর্চার জগতে উপভাষার যে-সংজ্ঞাটি বহুল প্রচলিত সেটি হলো, মেরিও পেই ও গয়নার ফ্রাংক-এর 'A dictionary of Linguistics' গ্রন্থের dialect-এর সংজ্ঞাটি — "A specific form of a given language, spoken in a certain locality or geographic area, showing sufficient differences from the standard or literary form of that language, as to pronunciation, grammatical construction and idiomatic usage of words, to be considered a distinct entity, yet not sufficiently distinct from other dialects of the language to be regarded as a different language."[৪] (1970, p. 56)। অর্থাৎ উপভাষা হলো ভাষার এমন একটা রূপ যা একটি বিশেষ অঞ্চলে প্রচলিত, যার সঙ্গে মান্য-ভাষা ও সাহিত্যিক ভাষার উচ্চারণগত, ব্যাকরণগত ও বাগধারাগত পার্থক্য আছে কিন্তু পার্থক্য আবার এতটাও নয় যে তাকে আলাদা ভাষার মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে।

ভাষাতাত্ত্বিক, অঞ্চলভেদে উচ্চারণগত ব্যাকরণগত ও বাগধারাগত যে-পার্থক্যের কথা বলেছেন তা অনেকখানি আপেক্ষিক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "... বাংলা ভাষার সহিত অসমিয়া ও উড়িষ্যার যে-প্রভেদ সে-প্রভেদসূত্রে পরস্পর ভিন্ন হইবার কোনো কারণ দেখা যায় না। উক্ত দুই ভাষা চট্টগ্রামের ভাষা অপেক্ষা বাংলা হইতে স্বতন্ত্র নহে। বীরভূমের কথিত ভাষার সহিত ঢাকার কথিত ভাষার যে-প্রভেদ, বাংলার সহিত আসামির প্রভেদ তাহা অপেক্ষা খুব বেশি নহে।"[৫] রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য থেকে একটা প্রশ্ন উঠে আসে, তাহলে কি অসমিয়া বা ওড়িয়ার সঙ্গে বাঙালির 'দেহমনের স্বভাবের' যে-পার্থক্য এক অঞ্চলের বাঙালির সঙ্গে অন্য অঞ্চলের বাঙালির পার্থক্য বর্তমানে সমপর্যায়ে পৌঁছে গেছে? অথবা এই পার্থক্যের ঠিক কারণ কী — তা অবশ্যই গবেষণার অপেক্ষা রাখে।

গ্রিয়ার্সন 'Linguistic Survey of India' গ্রন্থে রাঢ়ী, বরেন্দ্রী, বঙ্গালী ও কামরূপী — বাংলাকে এই চারটি উপভাষায় শ্রেণিবিভক্ত করেছিলেন। পরে সুকুমার সেন ঝাড়খণ্ডীকে উপভাষারূপে স্বীকৃতি দেন। ফলে বাংলার মোট উপভাষা হয়ে দাঁড়ায় ৫টি।

রাঢ়ী উপভাষায় প্রবেশ করার আগে আরো কয়েকটি বিষয় বলার আছে। আমরা দেখেছি ভাষা একটি কেন্দ্র থেকে ক্রমশ ভেঙেছে। আবার অঞ্চলভেদে এই পার্থক্য যখন বড়ো আকার ধারণ করেছে তখন ভাষাগুলোর মধ্যে সংযোগ রক্ষা করতে সমস্ত আঞ্চলিক ভাষার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটা মান্য ভাষা গড়ে তোলা হয়েছে। যেমন বিরাট ভারতবর্ষে বৈদিক ভাষা যখন অঞ্চলভেদে

© Santiniketan Sahityapath

বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে থাকে তখনই পাণিনি পারস্পরিক বোধগম্যতার জন্য বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার সম্মিলনে সংস্কৃতের মতো মান্যভাষার জন্ম দেন। তারপর ভারতবর্ষের বিস্তৃত অঞ্চলের মান্যভাষা যখন ছিল সংস্কৃত তখন অঞ্চলভেদে মানুষের কথ্যভাষা কিন্তু পরিবর্তিত হতে থাকে যা প্রাকৃত ভাষা নামে পরিচিত; এই প্রাকৃত ভাষা আরো পরিবর্তিত হয়ে অপভ্রংশের রূপ নেয়; এই অপভ্রংশ থেকে আবার আরো নানা ভাষার জন্ম হয়। যেমন, বাংলা, ওড়িয়া, অসমিয়া ভাষা এক সময় মাগধী অপভ্রংশের উপভাষা রূপে গণ্য ছিল। পরবর্তীকালে তা থেকে তিনটি পৃথক ভাষার জন্ম হয়। আজ আমরা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে কী দেখছি? বাংলা ভাষার পাঁচটি উপভাষা। তাহলে এই পাঁচটি উপভাষা কি মান্য বাংলা ভাষা থেকে ভেঙে ভেঙে তৈরি হয়েছে, নাকি বিভিন্ন উপভাষা থেকে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে এই মান্য ভাষা গড়ে উঠেছে? ভারতীয় ভাষার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসের দিকে লক্ষ রেখে বালা যায়, বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এই দুই ধারার-ই মিশ্রণ ঘটেছে। মান্য বাংলা থেকে যে উপভাষাগুলো ভেঙেছে তার প্রমাণ আমরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পাই। কেননা প্রাচীন ও মধ্যযুগের কোনো কাব্যে বা সাহিত্যিক নির্দশনে (সে-সাহিত্য যে অঞ্চলেই লেখা হোক-না কেন) একই সঙ্গে বিভিন্ন উপভাষিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ কবি যে-অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করছেন বা যে-অঞ্চলে বসে কাব্যরচনা করেছেন তাঁর কাব্যে সেই অঞ্চলের ভাষা-বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি তার থেকে দূরবর্তী অঞ্চলের ভাষা-বৈশিষ্ট্যও তাঁর কাব্যে লক্ষ করা যায়। যেমন, মুকুন্দরাম বর্ধমানের দামিন্যায় কিছুকাল বসবাস করার পর মেদিনীপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন এবং এখানে বসেই তিনি 'অভয়ামঙ্গাল' কাব্য রচনা করেন অথচ তাঁর কাব্যে দেখতে পাচ্ছি বঙ্গালী উপভাষার দৃষ্টান্ত। ''গোধিকা রাখ্যাছি বান্ধি দিয়া জল-ছড়া'' — এখানে 'রাখ্যাছি' পদটি লক্ষ করুন' পদটিরই ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে অপিনিহিতি হয়েছে তারপর 'ই'টি লুপ্ত হয়েছে। একে একধরণের অপিনিহিতিই বলা যায়। এই অপিনিহিতি আমরা বঙ্গালী উপভাষায় লক্ষ করি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে আমরা স্বতোনাসিক্যীভবনের প্রাবল্য লক্ষ করি; যেটি আবার ঝাড়খণ্ডী উপভাষার একটি বৈশিষ্ট্য। যদি ধরে নিই বড়ু চণ্ডীদাস বাঁকুড়ার ছাতনাতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাহলে তাঁর উপর এই উপভাষার প্রভাব থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু মনসামঙ্গালের কবি বিপ্রদাস জন্মেছিলেন উত্তর চব্বিশ পরগনার বাদুড়িয়ায়। তাঁর কাব্যেও আমরা স্বতোনাসিক্যীভবনের দৃষ্টান্ত পাই। ''কুবের ঈশান আর বন্দোঁ দিগপাল'' পঙ্‌ক্তিতে 'বন্দোঁ' পদে স্বতোনাসিক্যীভবন হয়েছে। লক্ষ করুন তার পাশেই 'দিগপাল' পদটি। দিকপাল থেকে দিগপাল হয়েছে অর্থাৎ ঘোষীভবন হয়েছে যা আবার রাঢ়ী উপভাষার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তারপর অঞ্চলভেদে যখন বাংলা উপভাষাগুলো স্পষ্ট আকার নিয়েছে তখন প্রধানত রাঢ় অঞ্চলের কথ্যভাষার উপর ভিত্তি করেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে মান্য বাংলা গড়ে উঠেছে। মান্যভাষা ও উপভাষার এই ভাঙাগড়ার খেলা চলেছে অবিরত।

৩

আপনারা জানেন বাংলার এক বিস্তৃত অঞ্চলকে রাঢ়ী উপভাষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রামেশ্বর শ সূক্ষ্ম বিচারে রাঢ়ী উপভাষাকে চার-ভাগে ভাগ করেছেন —

ক। পূর্ব-মধ্য রাঢ়ী : কলকাতা, উত্তর চব্বিশ পরগনা, হাওড়া।
খ। পশ্চিম-মধ্য রাঢ়ী : পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব বীরভূম, হুগলী, বাঁকুড়া (পূর্ব বাঁকুড়া)।
গ। উত্তর-মধ্য রাঢ়ী : মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, দক্ষিণ-মালদহ।
ঘ। দক্ষিণ-মধ্য রাঢ়ী : উত্তর-পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা।

এর সঙ্গে মাথায় রাখতে হবে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী যে-জেলাগুলি রয়েছে সেগুলিতে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উপভাষার প্রভাব স্বাভাবিক ভাবেই পড়েছে। যেমন, নদীয়ায় বঙ্গালীর প্রভাব, পশ্চিম বীরভূমে ঝাড়খণ্ডী প্রভাব ইত্যাদি। সুকুমার সেন এক একটি উপভাষাকে উপভাষাগুচ্ছ বলেছেন। তাঁর মতে, ''এগুলির কোনোটিই একটি বিশেষ উপভাষা নয়, প্রত্যেকটি কতকগুলি ঘনিষ্ঠ আঞ্চলিক কথ্যভাষার সমষ্টি।''[৬] এ-ধারণা অবশ্য তাঁর নিজস্ব নয়, ব্লুমফিল্ড ভাষাকে যে চারটি স্তরে ভাগ করেছিলেন তার ভিত্তিতেই সুকুমার সেনের ওই উক্তি। ব্লুমফিল্ডের এই শ্রেণিবিভাগ পুরোপুরি বাংলা ভাষায় প্রযোজ্য না হলেও আঞ্চলিক কথ্যভাষা বিভাগটি বেশ গ্রহণযোগ্য। কারণ এক রাঢ়ী উপভাষা বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যবহৃত হলেও বিভিন্ন জেলাভেদে বা অঞ্চলভেদে এ-ভাষার আঞ্চলিক রূপ ভিন্ন।

© Santiniketan Sahityapath

যেহেতু মূলত রাঢ়ী উপভাষা থেকেই আদর্শ বা মান্য চলিত বাংলার জন্ম সেহেতু রাঢ়ী উপভাষার অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য আমরা মান্য চলিতে লেখা বিপুল সাহিত্য ভাণ্ডারের মধ্যে পেয়ে যাই। সেগুলি নিয়ে আমি বিশেষ কিছু বলব না। এর বাইরে রাঢ়ীর যে আলাদা বৈশিষ্ট্য বিশেষত বীরভূম ও অধুনা পূর্ব বর্ধমানের কথ্যভাষার বৈশিষ্ট্যকেই আমি সাহিত্যিক দৃষ্টান্ত-সহ তুলে ধরা চেষ্টা করব।

রাঢ়ী উপভাষার যে-বৈশিষ্ট্যগুলি মান্য চলিতের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ সেগুলির দু-একটি এইরকম —

১। ই, উ, ক্ষ, য-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী 'অ', 'ও' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন, অতি, মধু, লক্ষ ইত্যাদি।
২। অভিশ্রুতি প্রবণতা। যেমন, করিয়া > করে, রাখিয়া > রেখে ইত্যাদি।
৩। নাসিক্যীভবন প্রবণতা। যেমন, বন্ধ > বাঁধ, চন্দ্র > চাঁদ ইত্যাদি।
৪। এছাড়া কর্তায় বিভক্তিহীনতা, কর্ম ও সম্প্রদানে 'কে' বিভক্তি, করণে 'দ্বারা', 'দিয়া' অনুসর্গ, আপাদানে 'হইতে', 'থেকে' অনুসর্গ, অধিকরণে 'এ' বা 'তে' বিভক্তি, সম্বন্ধে 'র' বা 'এর' বিভক্তি ইত্যাদি।

৪

এবার আমরা দেখে নেব মান্য চলিত বাংলা থেকে রাঢ়ী কোথায় কোথায় আলাদা হয়ে যাচ্ছে। পূর্ব বর্ধমান ও বীরভুমকে অবলম্বন করে আমার এই আলোচনা সেকথা আমি আগেই বলেছি। বীরভূমের কথ্য ভাষার জন্য আমি তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' আর পূর্ব বর্ধমানের কথ্য ভাষার জন্য রমাপদ চৌধুরীর 'বনপলাশির পদাবলী' উপন্যাসকে অবলম্বন করেছি। আর এই বিষয়ে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমার যেটা বারবার মনে হয়েছে, বাংলার গতানুগতিক যে-উপভাষা-বিভাগ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে, নতুন করে ক্ষেত্র-সমীক্ষা করে তার পুনর্বিন্যাস এবং এক একটি উপভাষার বৈশিষ্ট্যকে সুস্পষ্ট করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কেন বলছি একথা? কারণ —

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় চিঠিতে তাঁর 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' সম্পর্কে কবি কালিদাস রায়কে বলছেন, "দাদা, রাঢ়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' আপনার অজানা নয়। সেখানকার মাটি মানুষ তাদের অপভ্রংশ ভাষা — সবই আপনার সুপরিচিত।"[৭] আর উপন্যাসের ভিতরে তিনি একজায়গায় বলছেন, "এদেশের এরা, মানে হাঁসুলী বাঁকের মানুষেরা, নরনারীর ভালবাসাকে বলে 'রঙ'। 'রঙ' নয় — বলে, 'অঙ'। ওরা রামকে বলে 'আম', রজনীকে বলে 'অজুনী', রীতকরণকে বলে 'ইতকরণ', রাতবিরাতকে বলে 'আতবিরেত'। অর্থাৎ শব্দের প্রথমে 'র' থাকলে সেখানে ওরা 'র'-কে 'অ' করে দেয়। নইলে বেরোয় না জিভে, তা নয়। শব্দের মধ্যস্থলের 'র' দিব্যি উচ্চারণ করে।"[৮] উদাহরণ আরো আছে; যেমন, রবিবার > অবিবার, রতন > অতন, রক্ষা > রক্ষে > অক্ষে ইত্যাদি। তবে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র কাহারদের মুখে কেবল যে শব্দাদ্য 'র্', 'অ' হয়ে যায় তা নয়, আসলে শব্দাদ্য 'র্'-ধ্বনিটি লুপ্ত হয়ে যায় এবং এই 'র্'-ধ্বনির সঙ্গে যে-স্বরই যুক্ত থাকুন-না কেন সেই স্বর থেকে যায়। যেমন, কাহারদের মুখে 'রোদ' হয়ে যায় 'ওদ', 'রোজগার' হয়ে যায় 'ওজগার'। 'রাত' হয়ে যায় 'আত', 'রাগ' হয়ে যায় 'আগ', 'রাখিস' হয়ে যায় 'আখিস', 'রেখো হয়ে যায় 'এখো' ইত্যাদি। আর কেবল শব্দাদ্যই-বা কেন শব্দমধ্য 'র্' বা 'ঋ'-ও লুপ্ত হয়। যেমন, 'ক্রোধ' হয়ে যায় 'কোধ', 'প্রবীণ' হয়ে যায় 'পবীণ', 'দ্রব্য' হয়ে যায় 'দব্য', 'পিতৃপুরুষ' হয়ে যায় 'পিতিপুরুষ'। আবার অনেক সময় 'ঋ'-ধ্বনি 'র্'-ধ্বনিতে পরিণত হয়; যেমন, 'অমৃত' > 'অম্‌রেত'। শব্দান্ত্য 'র্'-ধ্বনিও অনেক সময় লুপ্ত হয়ে যায়; যেমন, 'শাস্ত্র' > 'শাস্ত'।

আবার এর উল্টোটা অর্থাৎ শব্দের আদি স্বর যে অনেক সময় 'র্'-ধ্বনিতে পরিণত হয় এমন দৃষ্টান্তও উপন্যাসে যথেষ্ট। শব্দের আদি 'অ', 'র' ধ্বনিতে পরিণত হচ্ছে সুচাঁদের উচ্চারণে; সে বলে — "আর একটি পাঁঠা তু দে পানু। আর পাড়া-ঘরে চাঁদা তুলে বাবার থানে পুজো হোক একদিন। জাঙলের নোক যদি রবহেলা করে আমরা আপনাদের কত্তব্য করি।"[৯] 'অবহেলা' হয়ে যাচ্ছে 'রবহেলা'। এখন শব্দের আদিতে অবস্থিত 'র', 'অ' রূপে বা শব্দাদ্য 'অ', 'র' রূপে উচ্চারিত হয় কোন উপভাষায়? বরেন্দ্রীতে! তাহলে সেই বৈশিষ্ট্য রাঢ়ীতে এল কীভাবে — তা অবশ্যই গবেষণার বিষয়। এরকম উদাহরণ আরো আছে। অনেক সম্য শব্দাদ্য 'উ', 'র'-ধ্বনিতে পরিণত হয়; যেমন, 'উপদেশ' হয়ে যায় 'রোপদেশ', 'উপদ্রব' হয়ে যায় 'রোপোদ্দরব'।

২। 'ওয়ালা' প্রত্যয়ের আদি অংশ লুপ্ত হয়ে ব্যবহৃত হয় বীরভূমের কথ্য ভাষায়। মাথলা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে লেখক তারাশঙ্কর বলছেন, "মাথলার আসল নাম রাখাল বা আখাল, কিন্তু দেহের অনুপাতে মাথাটা মোটা বলে কাহারেরা তাদের নিজস্ব

ব্যাকরণ অনুযায়ী সম্ভবত ওয়ালা প্রত্যয় করে করেছে — মাথলা।"[১০] বুঝতে পারছেন 'মাথাওয়ালা' কীভাবে ধ্বনিলোপের ফলে 'মাথলা' হয়ে যাচ্ছে?

৩। ভবিষ্যত ও অতীত কালের ক্রিয়া পদের শেষে অনেক সময় একটি অতিরিক্ত 'ন' যুক্ত হয়। যেমন, বনওয়ারী বলে, "তা কি করব বল? ভগবানের বিধেন যা তাই হবেন।"[১১] পানু বলে, "ইবার যে পুজোটি গেল মুরুব্বি, তার পাঁঠাটি খুঁতো ছিলেন।"[১২] কাহারদের মুখে 'বটে' হয়ে যায় 'বটেন'।

৪। বীরভূমে কথ্যভাষায় ন > ল ও ল > ন-রূপে উচ্চারিত হয়। রাঢ়ী উপভাষার একটি বৈশিষ্ট্য 'ল' কোথাও কোথাও 'ন'-রূপে উচ্চারিত হয় কিন্তু বীরভূমের কথ্যভাষায় ন > ল রূপে উচ্চারিত হওয়ার প্রবণতা বেশি। আমি নিশ্চিত এই ব্যাপারটির সঙ্গে আপনারা নানা ভাষণের সূত্রে খুবই পরিচিত। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় খুঁতো পাঁঠা সম্পর্কে পানুর বক্তব্য, "তখন ভেবেছিলাম, কেটে-মেটে একদিন পাড়ায় ভাগা দিয়ে খেয়ে লোব।"[১৩] সুচাঁদ বলে, "ভাল লয়, ভাল লয়, এ কখনও ভাল লয়।"[১৪] বনওয়ারী করালির উদ্দেশ্যে বলে, "লিয়ে যাও তোমার হাঁস, তোমার বলি লেয়া হবে না।"[১৫] হাঁসুলী বাঁকের কাহাররা 'নতুন'কে বলে 'লতুন', 'নিবি'কে বলে 'লিবি', 'আসতে নারব' তাঁদের মুখে হয়ে যায় 'আসতে লারব', 'নাও ঠ্যালা' হয়ে যায় 'লাও ঠ্যালা', 'নইলে' হয়ে যায় 'লইলে'। তবে উল্টোটা অর্থাৎ 'ল-ধ্বনি, 'ন'-ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে; যেমন কাহাররা 'লোক'কে বলে 'নোক', 'লক্ষ্মী'কে বলে 'নক্ষ্মী'।

৫। সমীভবন প্রবণতা ও স্বরভক্তি প্রবণতা লক্ষ করা যায় বীরভূমের উপভাষায়। কালোশশী আর একটু বসতে বললে বনওয়ারী বলে, "আমারও তো কাজকম্ম আছে ভাই।"[১৬] তাদের ভাষায় 'চন্দনপুর' হয়ে যায় 'চন্ননপুর', 'নিশ্চয়' হয়ে যায় 'নিচ্চয়', 'রাত্রি' হয়ে যায় 'আত্তি'। তাছাড়া সমগ্র উপন্যাসে কর্তা-কে কত্তা বলা হয়েছে। স্বরভক্তির দৃষ্টান্তও কম নেই। পাখি, 'ঘ্রাণ'কে বলে 'ঘেরান', কাহারদের মুখে 'যত্ন' হয়ে যায় 'যতন', যা স্বরভক্তির লক্ষণ। আবার স্বরভক্তি ও সমীভবন একসঙ্গে দেখা যায় যখন পানু প্রহ্লাদ-কে বলে পেল্লাদ।

৬। কাহারদের কথ্যভাষায় স্বরসঙ্গতি প্রবণতা যথেষ্ট লক্ষ করা যায়। তাদের উচ্চারনে 'বিধান' > হয়ে যায় 'বিধেন', 'জীবন' হয়ে 'জেবন', 'কল্যাণ' হয়ে যায় 'কল্যেণ', 'ধ্রুব' হয়ে যায় 'ধ্রোব', 'বিপদ' হয়ে যায় 'বেপদ', 'পানু' হয়ে যায় 'পেনো'।

৭। এছাড়া হাঁসুলী বাঁকের কাহারদের উচ্চারণে আরও কিছু স্বরপরিবর্তন বেশ প্রকট। তাদের ভাষায় অনেক সময় এ > ই হয়ে যায়; যেমন, এবার > ইবার। এদের উচ্চারণে অনেক সময় এ > অ্যা হয়ে যায়। প্রহ্লাদ বলে করালী "বাঁশের পাতায় কেরাচিনি ত্যাল ঢেলে আগুন লাগিয়েছে।"[১৭] হাঁসুলী বাঁকের কাহাররা 'দেশ'কে বলে 'দ্যাশ', 'জেল'কে বলে 'জ্যাল', 'পেট'কে বলে 'প্যাট', 'তেজ'কে বলে 'ত্যাজ'। এই ধরণের ধ্বনিপরিবর্তন আবার বরেন্দ্রী উপভাষার একটি বৈশিষ্ট্য। এছাড়া 'অ'-ও অনেক সময় 'অ্যা' হয়ে যায়। প্রহ্লাদ করালীর মারা বৃহতাকার সাপটিকে রাখতে বলে এইভাবে, "বেশ পেশস্ত জায়গায় 'আখ'। অ্যানেক লোক দেখতে আসবে।"[১৮] 'উ' অনেক সময় 'ও' হয়ে যায়। বনওয়ারীর উচ্চারণে 'দুগ্ধ' হয়ে যায় 'দোগ্ধ', 'গুপ্ত' হয়ে যায় 'গোপ্ত'। আবার এর উল্টোটা অর্থাৎ 'ও'-ধ্বনিকে 'উ'-ধ্বনিতে পরিণত হতে দেখা যায়; কাহারদের মুখে 'ও বেলা' হয়ে যায় 'উ বেলা'।

৮। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র চরিত্রদের মুখে বেশ কিছু ব্যঞ্জন-পরিবর্তন দৃষ্টি এড়ায় না। তাদের মুখে 'স'ধ্বনি যে 'চ' ধ্বনিতে পরিণত হয়, সে-দৃষ্টান্ত আপনারা আগেই পেয়েছেন; 'কেরসিন'কে প্রহ্লাদ বলেছে 'কেরাচিনি'। আবার 'শ', 'ছ' ধ্বনিতে পরিণত হয়, যেমন, 'শিয়রে' তাদের মুখে হয়েছে 'ছিয়রে'। 'শ্'-এর সঙ্গে যুক্ত 'র্'-কার, 'চ'-এ পরিণত হয়েছে; যেমন, 'আশ্রয়' হয়েছে 'আশ্চয়'। মহাপ্রাণী-ভববনের ফলে 'চিরায়ু' হয়েছে 'ছেরায়ু'।

৯। কাহারদের কথনরীতির মধ্যে বেশ কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। 'কেন'কে এই অঞ্চলের মানুষ 'কেনে' বলে। বনওয়ারীর মুখে বিপদের কথা শুনে কালোশশী মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে থাকলে বনওয়ারী বলে, "বলি হাসি তোমার আসছে?"[১৯] উত্তরে কালোশশী বলে, "কেনে? তোমাকে দেখে হাসি আসবে না কেনে?"[২০] সাপ মারার পর আনন্দ করার সময় করালীর এক অনুচর বলে, "নসুদিদি নাই তো পাখী নাচুক কেনে?"[২১] কাহারদের মুখের ভাষায় 'যাচ্ছে না' হয়ে যায় 'যেছে না', 'দেব' হয়ে যায় 'দোব'।

© Santiniketan Sahityapath

'টা'-নির্দেশক তাদের মুখে 'টো'-তে পরিণত হয়েছে; তাই 'একটা' হয়ে গেছে 'একটো'। বনওয়ারী চন্দনপুরের বাবুদের কথা বলতে গিয়ে বলে, " 'খানিক-আদেক' জমি বিলিও করবে শুনলাম।"[২২] এই 'খানিক-আদেক' শব্দের ব্যবহার বীরভূমের মানুষদের মধ্যে বেশ লক্ষ করা যায়। রতনের মুখে 'কি বল দেখি' হয়ে যায় 'কি বল দিনি', 'দেখি' হয়ে যাচ্ছে 'দিনি'। রাঢ়ী উপভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ঘোষীভবন, যা লক্ষ করা যায় কাহারদের কথ্য ভাষায়, 'কেবল বনওয়ারী কত্তামা ছেলের "শোগে" ঘুমোয় নাই।'[২৩] দেখুন, 'শোগ' শব্দে কেমন অঘোষ 'ক্'-ধ্বনি, ঘোষ 'গ্'-ধ্বনিতে পরিণত হচ্ছে। কাহারদের কথনরীতির এরকম নানা বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না।

১০। এছাড়া কিছু কিছু শব্দ যা এই অঞ্চলের মানুষদের মুখেই দেখা যায়। যেমন, ঝুঁজকি — অন্ধকার থাকতে ঢাকের বাজনা, বিত্যেব — ভয়ে চেঁচানো, গিদের — অহংকার ইত্যাদি।

আপনারা নিশ্চয় লক্ষ করেছেন বীরভূমের কথ্যভাষার মধ্যে কেবল যে রাঢ়ী উপভাষার বৈশিষ্ট্য রয়েছে এমন নয়, অন্য উপভাষার বৈশিষ্ট্যও তাদের কথ্যভাষায় রয়ে গেছে; আবার তাদের মুখের ভাষায় এমন অনেক বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হচ্ছে যা রাঢ়ী উপভাষায় আলোচিত হয় নি। ঠি এই কারণেই বলেছিলাম, বাংলার গতানুগতিক যে-উপভাষা-বিভাগ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে, নতুন করে ক্ষেত্র-সমীক্ষা করে তার পুনর্বিন্যাস ও এক একটি উপভাষার বৈশিষ্ট্যকে সুস্পষ্ট করার প্রয়োজন।

৫

বর্ধমানের কথ্য ভাষা। পূর্বেই বলেছি, সাহিত্যিক দৃষ্টান্ত হিসেবে আমি অবলম্বন করেছি রমাপদ চৌধুরীর 'বনপলাশির পদাবলী' উপন্যাসকে। পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান-কাটোয়া সড়কের পার্শ্ববর্তী স্থানে অবস্থিত বনপলাশি নামক এক গ্রামকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসটির ঘটনা আবর্তিত হয়েছে। বর্ধমানের কথ্য ভাষা এ উপন্যাসে খুব ভালভাবেই উঠে এসেছে।

১। রাঢ়ী উপভাষার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য অল্পপ্রাণীভাবন অর্থাৎ মহাপ্রাণ ধ্বনির অল্পপ্রাণ হয়ে যাওয়া। এই বৈশিষ্ট্য 'বনপলাশির পদাবলী' উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথনে বেশ লক্ষ করা যায়। আশি বছরের বুড়ি অট্টামা লাঠির ডগায় কাঠির মতো চেহারাটা ভর দিয়ে খুট খুট করে রায় বাড়িতে এসে চেঁচিয়ে বলে, "কই লো মোহনপুরের বউ কোতায় গেলি লো।"[২৪] তারা 'বর্ধমান'কে বলে 'বদ্দমান', 'অবস্থা'কে বলে 'অবস্তা'। মধ্যযুগের কবি মুকুন্দরামের কাব্যেও আমরা দেখি এই অল্পপ্রাণীভবন — 'ছিণ্ডিয়া পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার।' ফেলাইবো, পেলাইবোঁ হয়েছে।

২। 'ন'-ধ্বনি 'ল' ও 'ল'-ধ্বনি 'ন'-ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হতে অনেক ক্ষেত্রে বর্ধমান অঞ্চলেও দেখা যায়। যতিন বলে, "হোই যে আপনার মাঠের পুকুর রয়েছে, খাজনা লেয় না ওর? জলকর লেয় না? তা পুকুরগুলো বুজে গেল কার দোষে, সরকারের লয়?"[২৫] বংশী বলে, "চাঁপাদিদির বিয়েতে আমি একটা পদ্য নিকব।"[২৬] গোঁসাইদিদি, গিরিজাপ্রসাদ ও বংশীর উদ্দেশে বলে, "রাত দুপুর হল, খিদে নাগেনি গোপাল।"[২৭] বনপলাশির মানুষের মুখে 'নদী' হয়ে যায় 'লদী', 'লোক' হয়ে যায় 'নোক', 'লেখাপড়া' হয়ে যায় 'নেকাপড়া', 'নরম' হয়ে যায় 'লরম'।

৩। 'র' লুপ্ত হয়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা দেখা যায় সাধারণ মানুষের কথায়। অট্টামা বলে, "অ মোহনপুরের বউ, পেসাদ এয়েছে লো?... অ্যাঁ এয়েছে পেসাদ, আর আমায় একটা খপর দিলি না বউ?"[২৮] সে তন্দ্রা-কে বলে তন্দা। বংশীর মুখে দ্রব্য হয়ে যায় দব্য। লক্ষ্মী, উদাস ড্রাইভারি-কে বলে ডাইভারি। এখানে আরো একটি জিনিস লক্ষ করুন 'খবর' হয়েছে 'খপর'। বর্ধমান অঞ্চলে সাধারণ মানুষের মুখে এই খপর কথাটি খুব চলে। মেয়েদের মধ্যে কথোপকথনে যে সম্বোধনে 'লো' ব্যবহৃত হয় তাও দেখতে পাচ্ছেন।

৪। এখানকার সাধারণ মানুষেরা 'ওই' বা 'ও'কে বলে 'উ' আর 'এই' বা 'এ'কে বলে 'ই'। যতিন বলে, "খোড়ো চালে বিজলি বাতি জ্বলবে? উ সব আপনাদের শহর বাজারের নেগে।"[২৯] সে আরও বলে, "ই আজ্ঞে গান না, ই হল চাষীর কান্না।"[৩০]

৫। সমীভবন প্রবণতা। অট্টামা 'দুর্নাম'-কে বলে 'দুন্নাম', 'পার্বতী'-কে বলে 'পাব্বুতি'। সাধারণ মানুষ 'বর্ধমান'কে বলে 'বদ্দমান'। এখানে আবার অল্পপ্রাণীভবন ও সমীভবন একসঙ্গে লক্ষ করা যাচ্ছে। দেখা যায় স্বরসঙ্গতি প্রবণতা। বংশী অট্টামা সম্পর্কে বলে, "তেনার কথা বলতেও পেরানে বেথা নাগে গিরীদাদা।"[৩১] 'প্রাণ' হয়েছে 'পেরান' অর্থাৎ স্বরভক্তি। পাশাপাশি লক্ষ করুন তাঁর

© Santiniketan Sahityapath

কীভাবে 'তেনার' হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া বর্ণবিপর্যয় ও অন্তব্যঞ্জনাগম দেখা যায়। বংশী 'অপ্সরী'কে বলে 'অস্পরী', অট্টামার মুখে 'মতো' হয়ে যায় 'মতন'।

৬। সম্প্রদানে 'রে'-বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়, সাধারণত যা কবিতাতেই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। "পদ্ম বলে, সনঝেমনি চাল মজুরি পেলাম তো বলি যাই ডাক্তার বাবুরে দিয়ে আসি।"[৩২]

৭। বনপলাশির মানুষের কথনরীতির বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়, যা মান্য বাংলা থেকে স্বতন্ত্র। এবং ক্রিয়াপদ ব্যবহারেও পার্থক্য আছে। মোহনপুরের বউ 'পৌঁছিয়ে'কে বলে 'পৌঁছুয়ে'; গিরীন 'দিয়েছি'কে বলে 'দিইছি'। বনপলাশির মানুষের মুখে 'দেব' ক্রিয়াপদ হয়ে যায় 'দোব', 'এসেছে' ক্রিয়াপদ হয়েছে 'এয়েছে'। বংশীর গানের গলা সম্পর্কে বলতে গিয়ে যতিন বলে, "না আজ্ঞে, গলা নাই তো শুনবে ক্যানে বলুন? নোকে হাসি তামাশা করে।"[৩৩] অর্থাৎ 'কেন' অব্যয়ের 'ক্যানে' রূপে ব্যবহার। এই 'ক্যানে'র ইতিহাস অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাব শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অনুরূপ ব্যবহার আছে — 'তরল করিলে কেহ্নেঁ নয়ন যুগলে।' অর্থাৎ যা এখন রাঢ়ী উপভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য, তাই-ই এককালে মান্য সাহিত্যিক ভাষার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৮। এছাড়া বনপলাশির মানুষের মুখে 'দুপুর' হয়ে যায় 'দুকুর', 'অন্যপাড়া' হয়ে যায় 'বেপাড়া', 'থিয়েটার' হয়ে যায় 'থেয়টার', 'সুন্দর' হয়ে যায় 'সোন্দর'।

৬

এই তো গেল বর্ধমানের আঞ্চলিক ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এবার আমরা হাসান আজিজুল হকের 'আগুন পাখি' উপন্যাস, যে-উপন্যাসের প্রেক্ষাপট বনপলাশির পাশের একটি গ্রাম — যবগ্রাম, সেই উপন্যাসকে অবলম্বন করে বর্ধমানের মুসলিম সমাজের কথ্য ভাষার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করছি।

'আগুনপাখি' উপন্যাসের শুরুতেই উপন্যাসের কথক মুসলিম মেয়েটি বলতে থাকে তার জীবনকথা, 'আমার মায়ের য্যাকন মিত্যু হলো আমার বয়েস ত্যাকন আট-ল বছর হবে। ভাইটোর বয়েস দেড়-দু বছর। এই দুই ভাই-বুনকে অকূলে ভাসিয়ে মা আমার চোখ বুজল। ত্যাকনকার দিনে কে যি কিসে মরত ধরবার বাগ ছিল না।'[৩৪] লক্ষ করুন মেয়েটির মুখে কেমন 'অ'-স্বর, 'অ্যা'-স্বরে পরিণত হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে অল্পপ্রাণীভবনও ঘটছে; যেমন, 'যখন' > 'য্যাকন', 'তখন' > 'ত্যাকন'। 'মৃত্যু' হয়ে যাচ্ছে 'মিত্যু' (ঋ-লোপ), 'আট-ন বছর' হয়ে যাচ্ছে 'আট-ল বছর' (ন > ল); (অন্যত্র 'লম্বা > 'নোম্বা') উদাহরণ আরো আছে, মেয়েটির মুখের ভাষায় 'নিয়ম' হয়ে যায় 'লিয়ম', 'নাওয়া' (স্নান অর্থে) হয়ে যায় 'লাওয়া'। 'যে', হয়ে যাচ্ছে 'যি' (এ > ই), (অন্যত্র 'সে' > 'সি'); 'টা'-এর পরিবর্তে 'টো'-নির্দেশকের ব্যবহার, 'ভাইটা' > 'ভাইটো'।

মেয়েটি বলে যায়, 'মায়ের মওত আমার পষ্ট মনে পড়ে। এক বাদলের রাত-দোপরে জান গেল। কাঁদবার পয্যন্ত লোক নাই। বাপজি দখিন-দুয়োরি ঘরের উসারায় গালে হাত দিয়ে বসে থাকলে। তার এক খালা ছিল, আমি দাদি বলতাম — সেই দাদি এসে দেখাশোনা করলে। আমার মনে আছে — ঘরে জ্বলছে রেড়ির ত্যালের পিদিম, দেড় বছরের ভাই ঘুমিয়ে আছে অঘোরে, গায়ে একটো ক্যাঁথা চাপানো।'[৩৫] লক্ষ করুন মুসলিম সমাজে ব্যবহৃত আরবি-উর্দু শব্দ, 'মওত' (আরবি), 'দাদি' (উর্দু), 'খালা' (আরবি)। উপন্যাসে আরবি-উর্দুর পাশাপাশি ফার্সি শব্দের ব্যবহারও প্রচুর; 'বাবা' বা 'বাপ' হয়ে যাচ্ছে 'বাপজি' ('জি' ফার্সি শব্দ), 'আঁজির', 'ফাই-ফরমাশ', 'জান', 'বুজুর্গ' ইত্যাদি। মেয়েটির মুখে 'স্পষ্ট' হয়ে যাচ্ছে 'পষ্ট' (আদি 'স্'-লোপ)। সমীভবন — 'পর্যন্ত' হয়ে যাচ্ছে 'পয্যন্ত', উপন্যাসের অনত্র আরও দ্রিষ্টান্ত রয়েছে, যেমন, 'সূর্য' > 'সুয্যি', 'আশ্চর্য' > 'আচ্চয্যি', 'ভর্তি' > 'ভত্তি'। 'প্রদিপ' হয়ে যাচ্ছে 'পিদিম' ('র্'-লোপ এবং 'প' > 'ম')।

মেয়েটির মুখের ভাষায়, 'হচ্ছিল' ক্রিয়াপদ হয়ে যায় 'হছিল' ('চ্'-লোপ), 'গিয়ে' হয়ে যায় 'যেয়ে' ('যা'-ধাতুজ ক্রিয়ায় আদেশ হচ্ছে না); 'গিয়েছে' হয়ে যাচ্ছে 'গেয়েছে', 'রাতে' হয়ে যাচ্ছে 'রেতে' (স্বরসঙ্গতি), 'ছিলাম' হয়ে যাচ্ছে 'ছিলম' (মধ্যস্বর লোপ)। অল্পপ্রাণীভবন — 'আঁধার' হয়ে যাচ্ছে 'আঁদার', 'শুধু' হয়ে যাচ্ছে 'শুদু', 'হচ্ছে' হয়ে যাচ্ছে 'হচে', 'যাচ্ছে' হয়ে যাচ্ছে 'যেচে', যা অবশ্য রাঢ়ী উপভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'অ'-স্বর, 'ই'-স্বরে পরিণত হয়েছে, 'সময়' হয়েছে 'সোময়', 'যদি' হয়েছে 'যেদি', 'সংসার' হয়েছে 'সোংসার'। স্বরভক্তি — 'প্রায়' হয়ে যাচ্ছে 'পেরায়', 'শ্রী' হয়ে যাচ্ছে 'ছিরি'। 'বিপদ' হয়ে যাচ্ছে

'বেপদ' ('ই' > 'এ'); 'জীবন' হয়ে যাচ্ছে 'জেবন' ('ঈ' > 'এ')। 'মহীরুহ' হয়ে যাচ্ছে 'মহারুহ' ('ঈ' > 'আ')। 'আলাদা' হয়ে যাচ্ছে 'আলেদা' ('আ' > 'এ')। অন্ত্যব্যঞ্জনাগম — 'মতো' হয়ে যাচ্ছে 'মতুন', 'কিন্তু' হয়ে যাচ্ছে 'কিন্তুক'। অন্ত্যস্বরাগম — 'সহ্য' হয়ে যাচ্ছে 'সহ্যি'। 'কোনো' হয়ে যাচ্ছে 'কুনো' ('ও' > 'উ')। 'সামনে' হয়ে যাচ্ছে 'ছামনে' ('স' > 'ছ')।

সংক্ষেপে এই হলো বর্ধমানের মুসলিম সমাজে ব্যবহৃত মুখের ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য। বর্ধমানের মুসলিম সমাজের কথ্যভাষা বিশ্লেষণেও বোঝা যাচ্ছে, এদের মুখের ভাষার সঙ্গে রাঢ়ী উপভাষার বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য মেলে, অন্যদিকে বেশ কিছু মেলেও না। এর পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে সাধারণ হিন্দু বাঙালির মুখের ভাষার সঙ্গেও এ-ভাষার কিছু পার্থক্য বিদ্যমান — যা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

শুরু করেছিলাম রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়ে — শেষও করব রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়ে। 'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমরা কেবলমাত্র ভাষার দ্বারা ভাবপ্রকাশ করিয়া উঠিতে পারি না, আমাদের কথার সঙ্গে সঙ্গে সুর থাকে, হাতমুখের ভঙ্গী থাকে, এমনই করিয়া কাজ চালাইতে হয়।"[৩৬] এতক্ষণ আলোচনায় আমরা উপভাষার বাহ্যিক পার্থক্যটুকুই দেখালাম কিন্তু তার সুর বা ভঙ্গী সম্পূর্ণরূপে দেখাতে পারিনি। সুতরাং বর্ধমান, বীরভূম জেলার মানুষের কথ্যভাষার ওই বৈশিষ্ট্যগুলির পাশাপাশি তাদের ভাষা ব্যবহারে এই সুর ও ভঙ্গিটুকু জানা হলে, তবেই বোধহয় এ জানা সম্পূর্ণ হবে।

তথ্যসূত্র:

১। 'বাংলাভাষা-পরিচয়', 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' রবীন্দ্রনাথ, ঠাকুর, বিশ্বভারতী, কলকাতা, সুলভ সংস্করণ, ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৭৩

২। ওই, পৃ. ৫৭৩

৩। 'The use of Language', Leonard Bloomfield, Language, George Allen & Unwin LTD, London, 1957, p. 29

৪। 'A Dictionary of Linguistics', A. Pei Merio and Frank Gyanor, Philosophical Library, New York, 1954, p. 56

৫। 'ভাষাবিচ্ছেদ', 'শব্দতত্ত্ব', 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' রবীন্দ্রনাথ, ঠাকুর, বিশ্বভারতী, কলকাতা, সুলভ সংস্করণ, ষষ্ঠ খণ্ড, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৩৯

৬। ভাষার ইতিবৃত্ত সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, ১৯৯৬, পৃ. ১৪৮

৭। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর-রচনাবলী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, সপ্তম খণ্ড, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৭০

৮। ওই, পৃ. ১৮১

৯। ওই, পৃ. ১৮১

১০। ওই, পৃ. ২০৪

১১। ওই, পৃ. ১৭৭

১২। ওই, পৃ. ১৭৭

১৩। ওই, পৃ. ১৭৮

১৪। ওই, পৃ. ১৭৮

১৫। ওই, পৃ. ২১৮

১৬। ওই, পৃ. ১৮৯

১৭। ওই, পৃ. ১৯৮

১৮। ওই, পৃ. ২০২

১৯। ওই, পৃ. ১৮৭

২০। ওই, পৃ. ১৮৭

২১। ওই, পৃ. ২০৪

২২। ওই, পৃ. ১৯৩

© Santiniketan Sahityapath

২৩। ওই, পৃ. ২২৫
২৪। 'বনপলাশির পদাবলী', রমাপদ চৌধুরী, উপন্যাস সমগ্র, সপ্তর্ষী প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৯
২৫। ওই, পৃ. ১৮
২৬। ওই, পৃ. ৫৩
২৭। ওই, পৃ. ২৮
২৮। ওই, পৃ. ২০
২৯। ওই, পৃ. ১৮
৩০। ওই, পৃ. ১৮
৩১। ওই, পৃ. ৩০
৩২। ওই, পৃ. ৬০
৩৩। ওই, পৃ. ২০
৩৪। 'আগুনপাখি', হাসান আজিজুল হক, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮, পৃ. ৭
৩৫। ওই, পৃ. ৭
৩৬। 'ভাষার ইঙ্গিত', 'শব্দতত্ত্ব', 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, সুলভ সংস্করণ, ষষ্ঠ খণ্ড, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৪৪

—

Prantik Gabeshana Patrika